আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

হালনাগাদ শহুরে ভাবধারার মানুষ হয়ে গেলেও আজন্ম আমি গ্রামীণ সমাজের লোক। গ্রামের পরিবেশ আমার জানাশোনা-চিরচেনা। গ্রামের চাষকাজে দেখেছি কিছু কিছু গরুর লোনা-মাটির প্রতি খুব ঝোঁক। একমাঠে নিয়ে গেছেন কাজ করার জন্য। একটু সুযোগ পেলেই দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য মাঠের সেই লোনা-মাটির কাছে গিয়ে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অনবরত চাটতে থাকবে। 'যার নয়নে যারে লাগছে রে ভালো ভবে-এ'। এ অভ্যাস থেকে ফেরানো দায়। এই লোনা-মাটি চাটার ঝোঁক যদি সৃষ্টির সেরা জীবের– এদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কোনো শিক্ষা-ব্যবসায়ীর পেয়ে বসে তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে দেশের আইন ও পালের গোদারাও যদি জেগে ঘুমায়। শিক্ষা যখন এদেশে পণ্যের মতো বেচা-কেনা হয়, কিংবা শিক্ষা নিয়ে যখন বাণিজ্য হয়, তখন মনের অজান্তেই আমার দেখা সেই লোনা-মাটি চাটার কথা মনে পড়ে যায়। উদাহরণটাতে সংশ্লিষ্টমহল আমার প্রতি দারুণভাবে নাখোশ হবেন জানি, কিন্তু বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে আমি অনন্যোপায়। একজন ভুক্তভোগী শিক্ষক হওয়াতে অসহায়ত্ব তাই আরো বেশি।

শহুরে সমাজে নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা। শুরুতে উদ্দেশ্য ভালোই ছিল– শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বেসরকারি পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া। এর আগে এদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তখন শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী দেশে যাওয়া শুরু করলো। তারা সেখানে গিয়ে কতটুকু জ্ঞানসাধনা করছিল, সে ভিন্ন কথা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রতিষ্ঠা হওয়াতে অন্তত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হতে থাকলো। ব্যবসায়ীদেরও টনক নড়লো। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন যে, এদেশের লেখাপড়ায় অনভ্যস্ত টিক চিহ্ন দিয়ে পাশ করা কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সাধ্যমতো বিদ্যার্জন করে সার্টিফিকেট নিয়ে দেশে ফিরেছিল। বাকিরা কম্পিউটারের দোকান থেকে দামি কাগজে মনমতো পরীক্ষার ফল ছাপিয়ে এনে দেশে হাজির হয়েছিল। আমরা এত বছরেও সে অবস্থার সত্যাসত্য প্রমাণ করতে সহজে কেউ যাইনি। প্রকৃত তথ্য অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা তারুণ্যের বেপরোয়া উচ্ছাসে লেখাপড়ার অধ্যবসায়, নীতিমালা, শৃঙ্খলা, আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে সে-দেশে বদনাম কুড়িয়েছিল। এর কারণ একটাই– এদেশে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে সে-দেশে গিয়ে সে-দেশের ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাল মিলিয়ে লেখাপড়ায় পেরে না ওঠা। তাদের লেখাপড়ার ভিত্তিমান অনেকটা মজবুত। দুর্বল ভিত নিয়ে সবলের সাথে তাল মিলিয়ে কদিনইবা টিকে থাকা যায়। কিছুদিন পরেই খেই হারিয়ে ফেলে। অমনোযোগী হতে বাধ্য হয়। দিনে দিনে হতোদ্যম হয়ে যায়, তারুণ্যে লাগামহীন স্বাধীনতা অকাজ-কুকাজে প্রলুব্ধ করে। দেখার বিষয়, সে-দেশ কিন্তু এই দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করার জন্য অগতির গতি হয়ে শিক্ষার মান কমায়নি। এরাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। অনেকেই উপায়ান্তর না দেখে রাতদিন পরিশ্রম করে তাদের সমকক্ষ হয়ে যোগ্যতার সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশেও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একই অবস্থা আমরা দেখছি। যাকে বলে, 'যোগ্যতরের সংগ্রাম করে টিকে থাকা।' ভাগ্য ভালো যে, আমরা নিজ দেশেই 'অগতির গতি' হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে 'কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজা রে তোর দরবারে' ধ্বনি তুলে 'শিক্ষার বাজার' বসিয়েছি।

আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। শিক্ষার্জন নিয়ে অনেকটাই আশাবাদী হওয়া গেল। বছর পেরোতে পেরোতে দু-যুগ পেরিয়ে গেল। শিক্ষা নিয়ে কি অবস্থা চলছে, শিক্ষার গুণগত মানের অবস্থাই-বা কি– এদেশে বসবাসরত কারও অজানা নয়। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিগুণ বেড়েছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক পুরস্কার হিসেবে কাউকে কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়েছি। পুরোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া নতুন

প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানও আশানুরূপ নয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট আসে সরকারের কাছ থেকে, তাই ভিতরে ভিতরে যা-ই হোক শিক্ষার মানের অবস্থা পারতপক্ষে বাইরে বের হয় না, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কথা, নিয়োগবাণিজ্যের কথা মাঝে মাঝে বের হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট আসে পুরোটাই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। যত অসুবিধা এখানেই। টাকার বিনিময়ে তারা সার্টিফিকেট কিনতে চায়। কর্তৃপক্ষকে শিক্ষক-কর্মচারিদেরকে অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র বেতন দিয়ে পুষতে হয়, আবার লাভও ঘরে তুলতে হয়। তাই শিক্ষাটা পণ্যে পরিণত হয়েছে। শুধু মাসে মাসে নগদ টাকাটা দিতে পারলেই সময় শেষে ভালো গ্রেডের সার্টিফিকেট একটা হাতে এসে যায়। এটাকেই আমরা সার্টিফিকেট বিক্রি বলি। তাছাড়া সার্টিফিকেট তো আর ঝুড়িতে ভরে কেউ গুলিস্থানের মোড়ে বসে বিক্রি করে না। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশ-পনেরো লাখ টাকা খরচ করে পাশ সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির জন্য দোরে দোরে ঘোরে; মাসিক বেতন বারো হাজারেই রাজি। অথচ হাতে-কলমে টেকনিক্যাল শিক্ষা শিখলে এর থেকে অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারে। আমি নগণ্য একজন মাস্টাসাহেব হয়েছি বলে ছাত্রছাত্রীর পোশাক-আশাক নয়, বিদ্যার দৌড় মাঝে মধ্যে যাচাই করে দেখি। অনেকেরই একই অবস্থা। শিক্ষা ও জ্ঞানের স্ফুরণ নেই, প্রবলেম সলভিং এ্যাবিলিটি নেই, এ্যানালাইটিক্যাল এ্যাবিলিটি নেই, চিন্তার গভীরতা নেই, জীবনমুখী শিক্ষা নেই, কর্মমুখী শিক্ষা নেই, মানবিক গুণাবলি-সঞ্চারক শিক্ষা নেই, লেখাও নেই, পড়াও নেই। একপৃষ্ঠা বাংলা লিখতে দিলে কমপক্ষে আটাশটা ভুল খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু মোবাইল ফোন চালনা, ইংরেজি অক্ষর ব্যবহার করে বাংলা লেখা, আর ফেস বুক পড়া। শিক্ষার দশার কথা আর বলবো কত! অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় চায় মান বিবেচনা না করে বেশি ছাত্র ভর্তি করতে। শিক্ষকরা চায় চাকরি বাঁচাতে। এসব ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় যাওয়া কি খুব বেশি দরকার ছিল? এদেশে টেকনিক্যাল শিক্ষায় হাতে-কলমে জানা লোকবলের খুবই অভাব চলছে। টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে আমরা নজর দিচ্ছি না কেন? সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অগণিত টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেখানেও হাতে-কলমে শিক্ষাব্যবস্থার ঘাটতি। সার্টিফিকেট আছে, কাজ করতে জানে না। তাই বেকারত্ব বাড়ে। শুধু শিক্ষা কেন, এদেশে কোনো কিছুরই মান আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের গতি সর্বদা নিম্নমুখী। সুযোগ পেলেই লোনা-মাটি চাটার চেষ্টা করি।

মূলত আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যের ধারক হতে বড্ড আপত্তি। লিখছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে, মন পড়ে আছে অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের চিন্তায়। কোনোক্রমেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। হয়তো এদেশের রাজনীতির নীতির প্রতি ঘৃণার কারণে কারো দলে যোগ দিইনি বটে, তবে রাজনৈতিক সচেতনতা তো আছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে আজ পর্যন্ত শত চেষ্টায়ও দেশচিন্তা মন থেকে মুছতে পারিনি। আবার বায়ান্নটা বছর ধরে দেখছি। কতবারই যে আশায় বুক বাঁধলাম, আবার আশাহত হলাম– মনের জোয়ারভাটার শেষ নেই। এখন জীবনে ভাটার টান চলে এসেছে। ক্রমশই অসহায়ত্ব পেয়ে বসছে। আমি মনে করি, এদেশের শিক্ষামানের এহেন অবনতির জন্যও দেউলেপনা, বিকৃত রাজনৈতিক চিন্তাধারাই দায়ী। আমরা দেশের শিক্ষান্নোয়নের আগে দলবাজিকে বেশি গুরুত্ব দিই। আমরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে নিতে পারিনে, শিক্ষাকেও নিতে পারিনে, একথা ভাবতেও পারিনে। যতদিন রাজনীতিতে সুশিক্ষিত-বিবেকবান ও নীতিবান লোকের আনাগোনা শুরু না হবে, মিথ্যা ও কপটতার দাপট বন্ধ না হবে, এদেশের মুক্তি ততদিন অধরাই রয়ে যাবে। কারণও এই সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামানের অভাব। আমরা সাধু সাজি, সাধু হই না। প্রতিটি পদে পদে সাধারণ মানুষ ঠকছে। এটা পুরো জাতি-গোষ্ঠীর মূল্যবোধের অবক্ষয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভালো-মন্দ শ্রেণিবিভাগ করা খুবই কঠিন। সবাই নিজেদেরটাকে এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বলে দাবি করে। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমগুলো ফিটফাট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বড় বড়

দালান-কোঠা। কেউবা গাড়ির গ্যারেজ বা রান্নাঘরের উপরে শিক্ষা প্রদানের দোকান খুলে বসেছে। যত কোচিং সেন্টার ছিল, সব দিনে দিনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিয়েছে। খারাপ বলবো কোন বিবেচনায়? ছোটবেলায় গ্রাম্য হাটে ক্যানভেচারের 'শান্তি মলম' বিক্রি দেখতে যেতাম। বারো-তেরো বছর বয়সী একটা ছেলের গান খুব ভালো লাগতো। 'মাকালের পল (ফল) দেখতে বালো (ভালো), উপরি লাল ভিতরি কালো' বলে তাল দিলে ঢুলী ঢোলে জোরে একটা চাটি মারতো। এদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিশ্ববিদ্যালয়ই এক নম্বর বলে তাল দিয়ে জোরে একটা বিজ্ঞাপনের চাটি মারে। কিন্তু সে চাটি অন্তঃসারশূন্য। এটাই চেয়ে চেয়ে দেখি, বলার কিছুই থাকে না। শিক্ষকদের মাথার মধ্যে কোয়ালিটি নিয়ে যত চিন্তাভাবনাই থাক না কেন, ছাত্রছাত্রীরা না চাইলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করতে না দিলে কোয়ালিটি শিক্ষা দেবেন কাকে? ছাত্রছাত্রীরা বারো বছর ধরে না পড়ার অভ্যাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে জীবনটা এনজয় করার জন্য, আপনি তা থেকে নিবৃত করার কে? প্রয়োজনে আপনার বেতন হবে না, বিরুদ্ধে শ্লোগান হবে, পরিশেষে চাকরিও থাকবে না। বেকার হওয়ার বড় জ্বালা! 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' এদেশের পুরো সামাজিক পরিবেশ শিক্ষা দিচ্ছে, কীভাবে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়, এখানেইবা ব্যতিক্রম হবে কেন? ভালো ছাত্রছাত্রী যে এদেশে নেই, তা বলছি না। তারা সবাই কোনো না কোনো ভালো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। অল্প কিছু ভালো ছাত্রছাত্রী এবং অধিকাংশ 'অচল নামমাত্র ছাত্রছাত্রী' অগতির গতি হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট নিতে এসেছে। প্রায় সব জায়গায় একটা জিনিষেরই ঘাটতি– সেটা সুশিক্ষা ও লেখাপড়া করার ইচ্ছা। আপনার ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে গেলে তাদেরকে আকর্ষণ করতে হবে। তাই শিক্ষামান নিয়ে কোনো কথা বলতে পারবেন না। কিছুসংখ্যক শিক্ষকও অতি উৎসাহী হয়ে কর্তৃপক্ষের শিক্ষাবাণিজ্যের তালে তাল দিচ্ছেন। লেখাপড়া হোক, না হোক টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আপনি যেমন করেই হোক ব্যবসা চালিয়ে যাবেন। ব্যবসাতে একটু ট্যাক্টফুল হতে হবে। বলারও কেই নেই। দেশটার নাম বাংলাদেশ না? এখানে যত অরাজকতাই হোক, মিথ্যার বেসাতি হোক, আইনহীনতাই হোক, অন্যায় হোক– যে হতভাগা এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, তারই কপালে বিপদ আছে!

একশ দশটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে শুনেছি। হাতে গুণে বড়জোর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী আছে যারা পড়ালেখা করার জন্য ভর্তি হয়। বাকি ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ছাত্রছাত্রী একাধারে ফেল করেই চলেছে। অবশিষ্ট একশটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'নামে তালপুকুর, ঘাটে ঘটি ডোবে না।' এখানে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে পাঁচ থেকে পনেরো শতাংশ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করার জন্য ভর্তি হয়। বাকিরা নামমাত্র ছাত্রছাত্রী, পড়ালেখার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত এরাই সার্টিফিকেট কিনতে এসেছে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর ফেল করে টিকে আছে। শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। শিক্ষামানের এ অবনতির জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কম দায়ী করি। তারা শিক্ষা-ব্যবসা ধরেছে এটা সত্য। দায়ী প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষা। বলা যায়, গোড়ায় গলদ। সেখানে শিক্ষার ভিত খুবই দুর্বল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে 'অনভ্যাসের ফোটা কপাল চচ্চড় করে'। আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ের লেখাপড়া সিলেবাস মতো মানসম্মতভাবে পড়াতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, কিছু বোঝে না। আবার শেখার প্রতি আগ্রহও নেই, নেই জ্ঞানের তৃষ্ণা। বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবসায়ীরা ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শিক্ষার মান কমাতে কমাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে এনে ফেলেছে, কিছুসংখ্যক নীতিহীন শিক্ষক আত্মমর্যাদা ভুলে সে তালে তাল দিচ্ছে। শিক্ষা-বিবাগী ছাত্রছাত্রীদের সাজিয়ে-গুছিয়ে কপালে সৌভাগ্যের কুলতিলক পরিয়ে 'যার গা-র গন্ধে ঘুম হয় না, তাকে আতর আলী নামে ডেকে নিজেকে তৃপ্ত করে'।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখভালের জন্য যাদেরকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারাও শতেক মূল্যবান কাজে মহাব্যস্ত। শুধু শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ততা নেই বললেই চলে। অন্যান্য অনেক দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত। আমাদের দেশে এখনো তা সম্ভব, বারান্তরে বলবো। এদেশে ভালো মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা এখনো রয়ে গেছে, যদি আমরা শিক্ষার ব্যবসা বন্ধ করে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবিক গুণাবলী-সঞ্চারক শিক্ষা সত্যিকারভাবে শিক্ষাঙ্গনে দিতে পারি।

(৭ আগষ্ট ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।